Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবির প্রত্যাশা ও কালকেতুর নগর নির্মাণ

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.4
Pages	101-126
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কবির প্রত্যাশা ও কালকেতুর

Check for updates

ভীষ্মদেব চৌধুরী

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্ম এবং কাব্য-রচনার কালনির্ণয়-বিষয়ক তর্কবিতর্ক-কণ্টকিত আলোচনা আজ অবধি আমাদের কোন মীমাংসিত সত্যে উপনীত করতে সমর্থ হয়নি। তবে গবেষক-আলোচকবৃন্দের উপস্থাপিত তথ্য-তত্ত্ব ও টীকা-ভাষ্যে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত যে ষোড়শ শতকের বাংলা-দেশে মুকুন্দরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ-শতকের শেষার্ধে হয়েছিল তাঁর সাহিত্যিক-আবির্ভাব[১]; কেননা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বিধৃত জীবন ও সমাজে ষোড়শ শতকের বাংলাদেশই লাভ করেছে চিত্ররূপ। "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা/কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।"—কালনির্দেশক এই সন্ধ্যাভাষা এবং 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি চরণে 'সুবেহ্ বঙ্গালাহ্'র সুবেহ্দার মানসিংহের[২] নামোল্লেখকে উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করেই মূলত উল্লিখিত তর্ক-বিতর্ক বিস্তার লাভ করেছে। 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অথবা 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে মানসিংহের নামযুক্ত ঐ চরণ যে অহেতুক উপস্থাপন নয়—অধিকাংশ গবেষকের আলোচনায় তা স্বীকৃত। মানসিংহ মুঘল-সম্রাট আকবরের (শাসনকাল ১৫৫৬-১৬০৫) শাসনামলে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত বাংলার সুবেহ্দার-পদে নিযুক্ত ছিলেন। আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ করে পিতার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন (১৬০৫ খ্রী.) এবং মানসিংহ-কে পদচ্যুত ক'রে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রী-পুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলাদেশের সুবেহ্দার পদে নিয়োগ করেন।[৩] রাজা মানসিংহের শাসনকালে সেলিমাবাজ শহরের অধিবাসী নিয়োগী (নেউগী) গোপীনাথ নন্দীর কর্তৃত্বাধীন দামিন্যা নামক তালুকে নিবাস ছিল কৃষিজীবী মুকুন্দরামের। কিন্তু 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ' মানসিংহের শাসনকালেই ঐ-অঞ্চলের ডিহিদার নিযুক্ত হন মামুদ সরীপ। এই মামুদ সরীপের অত্যাচারে গ্রামবাসী প্রজাকুল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সামন্তশাসকের অর্থনৈতিক

শোষণ কবলিত নিরুপায়-মানুষ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। সাত পুরুষের নিবাস নিজ-বাসভূম পরিত্যাগ করে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকেও গ্রহণ করতে হয় স্বেচ্ছা-নির্বাসন। কোন্ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত একজন কবিকে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করল—কবি-লিখিত তার মর্মস্পর্শী বিবরণের চুম্বক-অংশ নিম্নরূপ :

শহর সেলেমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ হৈল সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে নব ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ।
রাজা-মানসিংহ-কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরীপ ॥
উজীর হৈল রায়জাদা ব্যাপারী বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হৈল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনি-উপকারে খায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খাএ দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নহে রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দি
কোন হেতু নহে পরিত্রাণে ॥
জান্‌দার প্রতি নাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেই থানা।
প্রজা হৈয়া ব্যাকুলি বিচে ঘর-কুটিয়ালি
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈল গম্ভীর খাঁ সনে।

দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
চণ্ডী পথে দিলা দরশনে ।।
ভাইলায় উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত
যদুকুণ্ড তেলী কৈল রক্ষা ।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ।।
... ...
নারায়ণ পরাশর পার হৈয়া আমোদর
উপনীত গোচড্যা নগরে ।
তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ।।
আসন পুখুরি-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ-প্রসূনে ।
ক্ষুধা পথ-পরিশ্রমে নিদ্রা গেল সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ।।
করিয়া পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সংগীত ।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই তরিয়া যাই
আরড়ায় হৈল উপনীত ।।[৪]

মামুদ সরীপের ডিহিদার-পদে নিযুক্তিকে দৈবে আস্থাশীল কবি প্রজা-গণের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ বিবেচনা করেছেন এবং রাজকর্মচারীদের অত্যা-চার, জমির মাপ ও টাকার অবমূল্যায়নের অপশাসনকে অসহায় জনগণ যে নির্বিরোধে দৈব-বিড়ম্বনা হিসেবে গ্রহণ করে স্বদেশ থেকে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করছিল তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার এই অরাজক মুহূর্তে নিয়োগী গোপানাথ নন্দী যখন বন্দী হলেন, পলা-য়নের পথ রুদ্ধ করে দুয়ারে দুয়ারে যখন পাহারাদার দণ্ডায়মান তখন এই গ্রাম্য-জনতারই এক প্রতিনিধি কবি মুকুন্দরামের জন্য এই বন্দীজীবনের অবসানকল্পে পন্থা উদ্ভাবন করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলতঃ মধ্যযুগের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও স্বেচ্ছায় পিতৃভিটা ও মাতৃভূমি ত্যাগের নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই স্বেচ্ছা-সিদ্ধান্ত যে স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ারই নামান্তর, তা

বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণভূমি আরড়ায় উপনীত স্বদেশত্যাগী কবি বাঁকুড়া রায়ের আনুকূল্য লাভ করেছেন, পরবর্তীকালে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন তাঁর পুত্র রাজা রঘুনাথ রায়ের। তবু একটি জিজ্ঞাসা সুপ্ত থেকে যায়—পিতৃভিটা থেকে উন্মূলিত তথা স্বদেশ-উৎকেন্দ্রিক বিতাড়িত কবিচিত্ত কি প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছিল পরবাস-জীবনে? নিজবাস-পরবাসের পার্থক্য অনুধাবন করা মুকুন্দরামের মত জীবনঘনিষ্ঠ কবির পক্ষে অনায়াসসম্ভব এবং স্বাভাবিক।[৫] তাই অনুমান করি কবির মগ্নচৈতন্যে একটি আদর্শ, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতামুক্ত স্বাধীন, শান্তশ্রী ও সমপ্রদায়নিরপেক্ষ নিজ বাসভূমির প্রত্যাশা ছিল সক্রিয়। কবির এই অন্তর্গত প্রত্যাশাই 'চণ্ডামঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরনির্মাণে বাস্তবায়িত হয়েছে; বাস্তব-জীবনের অচরিতার্থতা শব্দচিত্র-সমন্বয়ে লাভ করেছে অভিব্যক্তি।

চণ্ডীর ভূমিকা : কালকেতুর উদ্যোগ

মর্ত্যলোকে অন্ত্যজ ব্যাধ-সমাজে পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় চণ্ডীর অবলম্বিত ষড়যন্ত্র-সূত্রে অভিশপ্ত ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর-এর স্বর্গচ্যুতি এবং ব্যাধ-দম্পতি ধর্ম্মকেতু-নিদয়ার পুত্র-রূপে পৃথিবীতে আবির্ভাব। ধর্ম্মকেতু-নিদয়া দম্পতির এই নবজাতক কালে কালকেতু-নামে পরিচিত হয় এবং মর্ত্যে নীলাম্বরের অনুগামিনী স্ত্রী ছায়া, পৃথিবীতে সঞ্জয় ব্যাধ-কন্যা ফুল্লরা নামে যার পরিচয়, তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ব্যাধ কালকেতুর নির্বিরোধ পেশাগত জীবনে দৈব-বিড়ম্বনায় সূচিত হল বিরোধ-প্রতিরোধ; অরণ্যের পশুগণের সঙ্গে কালকেতুকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল এবং অবশেষে দেবী চণ্ডীর ইচ্ছায় দৈব-আনুকূল্যপ্রাপ্ত পশুগণ আত্মগোপন করতে সমর্থ হল। এক পর্যায়ে লীলাচপল ও বিচিত্ররূপিণী চণ্ডী গোধিকা রূপ ধারণ করে শিকার-শূন্য অথচ জীবিকাসন্ধানী কালকেতুর হাতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন। কালকেতুর গৃহে আনীত এই গোধিকারূপিণী চণ্ডী রূপান্তরিত হলেন ষোড়শী যুবতীর মূর্তিতে। সপত্নী-আশঙ্কায় উদ্বেলিত সন্দেহপরায়ণা ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করে তিনি নিজের ধনে ফুল্লরার অংশীদারিত্বের আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু তাতেও সরলা ফুল্লরার সন্দেহ মোচন হলনা, সে আহ্বান করে নিয়ে এল স্বামী কালকেতুকে। সেও পরগৃহবাস থেকে নিবৃত্ত করতে পারলনা ষোড়শী নারীকে। এক দিকে সপত্নী-বিদ্বেষ-জাগ্রত ফুল্লরার ভিন্ন মূর্তি অন্যদিকে লোকোপবাদের

ভীতি—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বিমূঢ়-বিহ্বলতায় কালকেতু দেবীকে মারণোদ্যত হয়েও ব্যর্থ হয়েছে, তীর-নিক্ষেপ মুহূর্তে দৈব-বশীভূত কালকেতু চিত্রবৎ স্থানুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। পরিশেষে পরিচয় প্রদানপূর্বক দেবী চণ্ডী কালকেতুর স্বভাবসুলভ অনুরোধে মহিষমর্দিনীর স্বরূপ ধারণ করলেন এবং অতঃপর একটি স্বর্ণ অঙ্গুরীয় এবং সাত ঘড়া ধন প্রদান করে গুজরাট বন কর্তন করে নগর নির্মাণ করার এবং দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলেন। এভাবেই একটি অদৃশ্য দৈব-উৎস থেকে প্রাপ্ত ধনে ধনী হয়ে কালকেতু নগরনির্মাণে উদ্যোগী হল। দৈবধন-প্রাপ্ত কালকেতুর নগরনির্মাণ প্রয়াস যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অন্তর্গত অভিপ্রায়েরই রূপায়ণ নির্মাণকার্যে বিশ্বকর্মা ও হনুমানের অংশগ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের দৈব দ্রুততার মধ্যেই তা চিহ্নিত হয়ে আছে। দৈব-উৎস ব্যতীত যেমন দরিদ্র কালকেতুর পক্ষে নগর-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, দরিদ্র অচরিতার্থ কবির পক্ষেও তেমনি স্বপ্নকল্পনার মধ্যেই মাত্র স্বস্তি-সন্ধান ও প্রত্যাশিত স্বদেশ-রূপের বাস্তবায়ন সম্ভব।

ধনের উৎস দৈব-নির্ধারিত হলেও অর্থের কার্যকারিতা ও গুণ বিষয়ে কালকেতু-ফুল্লরার বাস্তবজ্ঞান সুতীক্ষ্ণ। জীবনে অর্থের ভূমিকা বিষয়ে সতর্ক ছিলেন মুকুন্দরাম; তাঁর পাত্র-পাত্রীর উচচারিত সংলাপে অর্থের ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। ফুল্লরার উচচারণে অল্প-অর্থ-প্রাপ্তিতে দারিদ্র্যের দুর্নাম লাঘব না-হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং কালকেতুর উদ্দেশ্যে চণ্ডীর বলা আপ্তবাক্যে অর্থের সর্বকালিক ও সার্বত্রিক ধর্মবৈশিষ্ট্য হয়েছে অভিব্যঞ্জিত। ফুল্লরা ও চণ্ডীর উচচারিত নিম্ন-লিখিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের সারসত্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য :

ক. বীর হস্তে দেন চণ্ডী মানিক-অঙ্গুরি
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।
একটি অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।
(অধ্যায় ১০৭ : পৃ. ৬৩)[৬]

খ. অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড় (কালকেতু)
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাড়।
পুরোহিত কেবা মোর হইব ব্রাহ্মণ
নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন। (চণ্ডী)

তোমার পুরোহিতে পাব আমার দরশন
নিবেক তোমর দান উত্তম ব্রাহ্মণ।
(১০৭ : ৬৪)

অতঃপর আশ্বস্ত কালকেতু 'বেরুনিয়া জন'-এর সহযোগিতায় গুজরাট নগর নির্মাণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে 'বন-কর্ত্তন'-এ নিয়োজিত হয়। নির্মিতব্য এই নগরের পরিকল্পনায় ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং বিশেষতঃ ১১৫ সংখ্যক অধ্যায় (কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল': শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমী, নয়া দিল্লী) তাৎপর্যপূর্ণ। এসব অধ্যায়ে একদিকে যেমন বেরুনিয়া বা দিন-মজুর হিসেবে আগত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই তেমনি প্রধানতঃ ১১৫ সংখ্যক অধ্যায়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ে জ্ঞান, সৌন্দর্যানুভূতি ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় লাভ করা যায়। গৃহ-বিতাড়িত জীবন-অভিজ্ঞ মুকুন্দরাম সমাজের অমঙ্গল-শক্তির মুখোমুখী হয়ে অন্তরে যে কল্যাণবোধ লালন করেছিলেন—বলা যায় তাঁর সেই কল্যাণ-কামী আদর্শের বাহক স্বর্গভ্রষ্ট, অনার্য-মানবশিশু কালকেতু। 'বন-কর্ত্তন' অধ্যায়ে কালকেতুর ঔচিত্যবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতিতে মুকুন্দরামের দৃষ্টিভঙ্গি তাই প্রতিফলিত। এই অধ্যায়ে কালকেতু বন-কাটার ক্ষেত্রে নির্বিচারী হয়নি; নগরের সৌন্দর্য-সংরক্ষণ, পূজা-অর্চনার পটভূমি প্রস্তুতকরণ এবং জনগণের প্রাত্যহিক উপযোগিতার প্রসঙ্গটি স্মরণ রেখে সে বৃক্ষ-নিধনযজ্ঞে বাস্তবানুগ ঔচিত্যচেতনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশে তার পরিচয় প্রকাশিত :

পলাষ পাকড়ি খদিরের বন
মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন
ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে
মাণ্ডুড়ি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি
নাদন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে।
ঘাঁটফুল ঘাঁটুকাল কাটিলা কেয়া
উকন্যা বিরুন্যা ববাই লআ
হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা

কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।

মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা
টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গন
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারীকেল নগরে শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম...
(১১৫ : ৬৯)

কালকেতুর ঔচিত্যশাসিত এই বৃক্ষনিধন-পর্বে স্থাপিত রয়েছে নির্মিতব্য গুজরাট-নগরের ভিত্তিভূমি। পরিবেশ-বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য-শাস্ত্রের সমন্বয়ে পরিকল্পিত এই নগরী যে একটি আদর্শ কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিভূ হয়ে উঠবে এই অধ্যায় তারই নিগূঢ় ইঙ্গিতবহ।

গুজরাট-নগরের আদর্শ ঃ মধ্যযুগের নগর

কালকেতুর নগরনির্মাণ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেন এই চকিত-অভিমত পোষণ করেছেন যে "এই নগরপত্তন-বর্ণনায় সেকালের টাউন-প্ল্যানিঙের একটা আদর্শ পাই।"[৭] কবিকঙ্কণ-রচিত সমগ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে-সব নগরের বিবরণ ও নামোল্লেখ রয়েছে সেগুলি হল বারাণসী, গুজরাট, কলিঙ্গ, উজানী নগর, গৌড় ও সিংহল। এতদ্ব্যতীত 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে উল্লেখিত 'সহর সেলিমাবাজ' এবং কাব্যান্তর্গত বারাণসী ও গৌড় নগর-বিষয়ে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা অথবা শ্রুতি ও অধ্যয়ন সূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা থাকা কবির পক্ষে অসম্ভব নয়। কলিঙ্গ-নগর প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন : "প্রত্যেক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলিঙ্গদেশেই চণ্ডীপূজার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল।...কিন্তু এই কলিঙ্গদেশ কোথায়? প্রাচীন বাংলার কবিদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান যে খুব সুস্পষ্ট ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব, কলিঙ্গের উল্লেখ

হইতেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাগোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। ইহা দ্বারা এইটুকু মাত্র মনে করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ মনে করিতেন, বাংলাদেশের বাহিরে লৌকিক চণ্ডীপূজা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, বাংলা-দেশে তখনও ইহার বহুল প্রচলন হয় নাই।"[৮] প্রব্রাজনকৃত কবির দামিন্যা থেকে আড়রা-র যাত্রাপথ সরেজমিন-অনুসরণ করে এসে ক্ষুদিরাম দাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, গুজরাট নগরের সমাজ-বিন্যাসের মতই আড়রার "নিকটবর্তী চন্দ্রকোনা ঐরকম সুশৃংখল লোকবসতির চিহ্ন আজও বহন করছে।"[৯] চন্দ্রকোনা-কে গুজরাটের আদর্শ রূপে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি এক নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে "গুজ্জ অর্থাৎ ছোট রাষ্ট্র হল গুজরাট, যা কলিঙ্গ রাষ্ট্রের অধীন রূপেই প্রথমে চিত্রিত হয়েছে। এবং এই নগর গুর্জর রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত।"[১০] এত-দ্ব্যতীত, 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে উল্লেখিত 'শহর সেলেমাবাজ'-এর টীকাভাষ্যে তিনি বাংলায় আফগান শাসক সুলেমান কররানী'র (শাসনকাল ১৫৬৫-১৫৭২ খ্রী.) নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত 'সুলেমানাবাদ' শহরের নাম নির্দেশ করেছেন।[১১] কিন্তু ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্যে আমরা বিপরীত তথ্য পাচ্ছি, তিনি লিখেছেন: "সুলেমানের (কররানী) আমলে গৌড় নগরী অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায় সুলেমান টাণ্ডাতে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।"[১২] কাজেই কাব্যে উল্লেখিত নগরগুলির মধ্যে আমরা কেবল গৌড় ও বারাণসী (বর্তমান বেনারস) এই দুটি সুপ্রতিষ্ঠিত নগরকেই কবির আদর্শ রূপে চিহ্নিত করতে পারি, যাদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধি তর্কাতীত। ষোড়শ শতকের বাংলাদেশে গৌড় নগরীর রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং প্রাচীনকাল থেকে তীর্থস্থান রূপে ও বিশেষতঃ মুঘল যুগে ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-নগরী হিসেবে বারাণসীর তাৎপর্য ইতিহাস-স্বীকৃত।

আমরা ইতঃপূর্বে আমাদের আলোচনায় কবির 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে উল্লেখকৃত মানসিংহের নাম এবং বাংলাদেশে তাঁর শাসনকালের সময়সীমায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যরচনার প্রচারিত মতকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করেছি। মুঘলদের সাম্রাজ্যবিস্তারী শোষণ বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থ-নীতির উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া[১৩] সৃষ্টি করেছিল তা ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যক্তি-মাত্রই জ্ঞাত। কবিকঙ্কণ তাঁর 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে সামাজিক-রাজনৈতিক

বিশৃঙ্খলার যে চিত্রাবলী অঙ্কন করেছেন, ক্ষুদিরাম দাস-এর মতে সেগুলি বাংলাদেশে "সুবেহ বাঙ্গালাহ্'র সুবেহ্দার মানসিংহের শাসনকালে মুঘলদের অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যে আরোপিত আকবরের 'নববিধান'-এরই প্রতিচ্ছবি।[১৪] বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অধিকাংশ নগরেরই স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকালীন। এরই ফলস্বরূপ এবং কিছুটা রাজনৈতিক কারণে বাংলায় তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজধানীর ঘন ঘন স্থানান্তর ঘটেছে। হামিদা খাতুন নাক্‌ভি তাঁর অভিসন্দর্ভে বাংলার রাজধানী স্থানান্তর ও তার কারণের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

১. Finally, the too frequent changes in the courses of the Bengal rivers prevented its towns taking roots, and gaining any stability of existence. Owning to the low level of land the principal means of communication in Bengal being rivers, its towns could by and large flourish merely on their banks or on their terminal points and mouths. Therefore, the constant changes in the river courses would naturally make the towns of ephemeral character.[১৫]

২. The instability of the towns of Bengal is best reflected in the periodical transfer of its capitals. At the advent of Bakhtiyar Khalji in 1202, Nadiya was the seat of the Hindu rulers. Muslim Sultans had moved over to Lakhnauti or Gaur which had originally been founded in the mid-12th century by the Hindus. ...

In 1340 Haji Ilyas transferred the capital to Pandua renaming it Firozabad, which was abandoned by Sultan Mahmud I before 1459 in favour of Gaur. ... Sulaiman Karrani (1564–72), therefore again moved away from Gaur fixing Tanda Khwaspur located four miles west of Gaur as his capital. Very soon Tanda had completely replaced Gaur, though there were two brief interregnums of reversions to Gaur : Once on Humayun's entry in Bengal in c. 1537-39 when he took residence there renaming it Jannatabad and the second occasion was when Munim Khan Khan-i-Khannan in 1575 insted on making it his capital. Shortly afterwards Munim Khan and his army were carried

away in an epidemic so that Gaur was finally given up and Tanda rose instead. ...

Around the last decades of the sixteenth century, the Ganges was again changing its course moving away from Tanda. In addition, the incursions of Magh and Portugese had also jeopardised its security, therefore, in c. 1596, *subedar* of Bengal decided to transfer the seat of his government to a town variously named as Akmahal, Rajmahal or Akbarnagar. After his foundation it was helped to grow into a 'choice city'. But even this city could command no stability. Early in the following century, the incumbent Islam Khan decided to appoin Jahangirnagar (Dacca) as the seat of his governmen[t] [1608] as he considered it better situated for his opera[t]tions of Bengla.[১৬]

কাজেই গুজরাট নগরীর নির্মাণ-পরিকল্পনায় বঙ্গদেশের অস্থিতিশীল এ-সব প্রধান নগরীর (Metropolitan City) আদর্শ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পক্ষে গ্রহণ না করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বরঞ্চ উত্তর-ভারতের স্থিতিশীল প্রধান নগরসমূহ, বিশেষতঃ মুঘল-শাসনামলে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সম্প্রসারিত অথবা নব-প্রতিষ্ঠিত নগরসমূহের সর্ব-ভারতীয় গুরুত্ব বিবেচনা করেই বলা যায় এদের সমন্বিত বৈশিষ্ট্য অথবা কোন একটি বিশেষ নগরী গুজরাট-নগরীর আদর্শ হওয়া অসম্ভব নয়। এই অনুমানের সপক্ষে দিল্লী, আগ্রা অথবা বেনারস নগরীর নামোল্লেখ করা অযৌক্তিক নয়। মুঘলদের শাসনামলে দিল্লী ও আগ্রার রাজনৈতিক গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানরূপে 'পবিত্র গঙ্গা নদীর' তীরবর্তী কাশী বা বারাণসী এবং মুঘল-সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র হিসেবে অভিন্ন বেনারস নগরীর তাৎপর্য ইতিহাস-স্বীকৃত। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যান্তর্গত "কালকেতু-উপাখ্যান"-অংশের একটি স্থানে আমরা এই বারাণসী বা বেনারস (কাশীর নামান্তর) নগরের উল্লেখ দেখতে পাই। বিবাহোত্তর কালে কালকেতুর 'সম্বল অর্জনে'র সামর্থ্য এবং তাদের সুখী দাম্পত্যজীবন প্রত্যক্ষ করে ধর্মকেতু-নিদয়া সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পুত্র-পুত্রবধূর ওপর ন্যস্ত করে "মুক্তি হেতু বারাণসী করিল পয়ান।"[১৭] কোন কোন সমালোচক ব্যাধ-দম্পত্তির এই তীর্থযাত্রার পশ্চাতে ব্রাহ্মণ

বর্ণ-অন্তর্গত কবির ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ব্রাত্যজনের জীবনায়নে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে সন্দেহ করেন।[১৮] তাঁদের এই সন্দেহ যদি অমূলক না-হয় তাহলে কালকেতুর পরিকল্পিত নগরে ব্রাহ্মণ-কবির নগর-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার প্রভাব যে পড়বে-না তা-ই বা কেমন করে বলা যায়? তীর্থস্থান-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পুণ্যার্থী-হিন্দুর সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের যোগাযোগ প্রাচীন কাল থেকে। অতএব, উল্লিখিত তথ্য ও ব্যাখ্যার সূত্র ধরে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বারাণসী কিম্বা দিল্লী ও আগ্রার মত মুঘল সাম্রাজ্যের কোন একটি নগর অথবা তাদের সব কটির বৈশিষ্ট্যসমূহ সমন্বিত হয়েই পরিকল্পিত হয়েছে কালকেতুর আদর্শ গুজরাট নগর। আর এ-ভাবেই অচরিতার্থ কবির প্রত্যাশা নবনির্মিত এই কাল্পনিক নগরের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান পেয়ে লাভ করতে চেয়েছে চরিতার্থতার আনন্দ।

কালকেতুর নবনির্মিত নগরের প্রধান যে দু'টি বৈশিষ্ট্য তার একটি হল সমাজের অন্তর্কাঠামোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং এই সমাজ-অন্তর্গত মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ও অর্থনৈতিক জীবন। অপরটি নগরের অবকাঠামোগত দিক—প্রধানত সৌন্দর্যবোধ ও ঔচিত্যজ্ঞান-শাসিত 'টাউন-প্ল্যানিং' বা নগর-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। কবির প্রত্যাশা এবং কল্পনার চরিতার্থতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, স্বদেশ-উন্মূলিত কবির স্বদেশানুরাগ ও স্বভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসাই তাকে অনিশ্চিত বর্তমানে দাঁড়িয়ে বর্ণাঢ্য ও আদর্শিক ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনায় যুগিয়েছিল প্রেরণা। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবি-প্রতিভার প্রধান যে বৈশিষ্ট্য বাস্তব-প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর এই অনুভবই তাঁকে কল্পিত নগর নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাস্তবাশ্রয়ী হতে সাহায্য করেছিল। তাঁর পরি-কল্পিত নগর তাই সমকালীন ভারতের বিশেষতঃ মুঘল-সাম্রাজ্যের আদর্শ নগরসমূহের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে।

কালকেতুর নগর-পরিকল্পনায় সৌন্দর্যজ্ঞান-অনুমোদিত বৃক্ষ-নিধনের পর পরই দেখি নির্মিত হয়েছে কালকেতুর রাজপ্রাসাদ। তালবৃক্ষাকৃতির প্রাচীর-ঘেরা এই প্রাসাদ 'চতুঃশালা'য় বিন্যস্ত; অন্তঃপুরে শান-বাঁধানো সরোবর, প্রাসাদের উত্তরে গবাক্ষ, পূর্বে সিংহদ্বার। প্রাসাদ নির্মাণের পর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে কারাগৃহের এবং অতঃপর নির্মিত হয়েছে 'চণ্ডিকার

দেউল'। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে যেদিন আকাশে শুকতারা ও চন্দ্রের যুগ্ম অবস্থান সেই শুভলগ্নে কালকেতুর এই নগরের ভিত্তি-উদ্বোধন। রাজপ্রাসাদ, কারাগৃহ এবং চণ্ডী-দেউল নির্মাণের পর ক্রমশ গড়ে তোলা হয়েছে পরিকল্পিত এই নগরী। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নগরীতে নির্মিত হয়েছে সদর রাস্তা ('নাছ-বাট') স্বর্ণকপাট-যুক্ত পাঠ-শালা (পাটশাল), বিষ্ণুর দেউল, নগরীর সিংহদ্বারে স্থাপিত হয়েছে জলাশয়, নির্মিত প্রতিটি বাড়ীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে কূপ বা কুয়ার, 'নগর-চত্বরে' গড়ে উঠেছে শিব-মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা, গৃহ-বাসীদের জন্য তৈরী হয়েছে দিঘল মন্দির—যা পরিচিত হবে প্রবাসীদের সম্মিলন-ক্ষেত্ররূপে। ইটের পাঁজা তৈরী করে কাষ্ঠ-আগুনে পুড়িয়ে তৈরী করা হয়েছে ইট এবং ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে দেউল, অনাথমণ্ডপ (হুদুরা), মঠ (মট), বহির্শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তৈরী হয়েছে পরিখা; পত্তন করা হয়েছে হাটের—এবং এভাবেই সৌধময় নগরী-রূপে গড়ে উঠেছে গুজরাট। আমরা জানি মুকুন্দরামের সমকালে রাজধর্ম ছিল ইসলাম—কালকেতুকে তাই দেখি সর্বধর্মের মানুষকেই সে তাঁর নগরীতে আবাস-স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। ঔচিত্য-শাসিত কবির আদর্শের বাহক কালকেতু তার পরিকল্পিত নগরে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। পূর্বভারতের ভূ-প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় স্থাপিত এই নগরীতে ঔচিত্য-শাসিত কালকেতু মুসলমানদের আবাস স্থাপনের জন্য নগরের পশ্চিম দিকটি নির্ধারণ করেছে। নগরীর পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম অধিবাসীদের জন্য নির্মিত হয়েছে আবাস গৃহ, বৈঠকখানা (দলিজ), 'রন্ধনশালা' এবং মসজিদ ('মসিদ')।

কালকেতুর নগরের এই অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন প্রধান প্রধান নগরীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য-সন্ধান যে অহৈতুক নয়, কবিকঙ্কণের সমকালীন ভারতের নগরের বৈশিষ্ট্য ও ইতিবৃত্তই তার প্রমাণ। আর কবি নিজেও যে যুগপৎ ইতিহাসনিষ্ঠ ও স্ব-কালে আধুনিক সে-পরিচয় তাঁর রচিত 'কবিত্বের বিবরণ' অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিশাল মুঘল-সাম্রাজ্যের নির্মিতব্য নগর-সমূহের পরিকল্পনার অত্যাবশ্যকীয় দিক হামিদা খাতুন নাক্‌ভী নির্দেশ করেছেন :

Town planning on a large scale is a modern idea, but on a limited scale it was not entirely unfamiliar in the medieval times. Some pattern seems to have been then followed in the location of forts, mansions, mosques, hammams, gardens, beazars and other public buildings, and the principal wards of the city generally occupying sites according to their importance. ...

Cities were protected by walls built around them, while the forts were constructed to provide against the contingency of an invasion or a surprise attack. They usually possessed effective defence measures, had paved roads within convenient location of offices, *Karkhanas*, Kitchen quarters for the staff, adequate water supply and accommodation for long-term storage of other human needs.[১৯]

তিনি তাঁর গ্রন্থে বারাণসী বা বেনারস নগরীর অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও সমাজবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত যে পরিচয় দিয়েছেন কালকেতুর গুজরাট নগরীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সুগভীর। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

১. Benaras has been represented as a large town from the beginning of our period. Finch (W. Finch, Foster) noticed its circuit to be eight to ten Kos. The population was dense to the extent of making the city overcrowded and congested, a fact which was aggravated by high buildings, ... narrow streets.

But the city had a fine sky line. It was crammed with temples built with poius care and great expense. ...The houses of the Hindu merchants, situated mostly on the cutskirts of the city, were large and well built with equally well kept gardens and courtyards.[২০]

২. The merchant community of Benaras was also considerably wealthy and occupied a special position in the city's social set-up. The *Khattris* and the *banias*—castes of businessmen—were reckoned as some of the chief classes amongst the Hindus, and they were also the

real patrons of Hindu scholars and teachers. ... Thus the Brahmans, the chief Hindu caste devoted to learning, abounded in the city.[২১]

৩. Even so, learning and academic pursuits of the city are nothing when compared with its deeps sancity to the Hindu masses : the former, in fact, seems to be an offshoot of the latter. From the earliest times the city has been pre-eminently a place of Hindu pilgrimage. ... Bathing in the river Ganges at Benaras constitutes one of the tenets of Hindu religion, and a large mass used to assemble there in order to perform thir religious rituals more than four hundred temples were to be found witnin the city....

Mosques were also found in the city. In the adjoining part of the main town there were some tombs which would a'tract Muslim masses.[২২]

উপর্যুক্ত আলোচনা-সূত্রে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অভীষ্ট এবং কালকেতুর পরিকল্পিত গুজরাট-নগরী বিশাল মুঘল-সাম্রাজ্য অন্তর্গত প্রধান নগরীসমূহেরই প্রতিভূ-স্বরূপ। বিশেষত বাংলার তুলনামূলক নিকটবর্তী উত্তরভারতীয় বারাণসী বা বেনারস নগরীর অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক মানুষের শ্রেণী-বিভাজনের সঙ্গে কালকেতুর গুজরাট-নগরের সাদৃশ্য নিকটতর। এ-প্রসঙ্গে ধর্ম্মকেতু-নিদয়ার বারাণসী-যাত্রার তথ্যটি স্মরণে রাখলে—বারাণসীর সঙ্গে বাংলার প্রত্যক্ষ ও নিগূঢ় সম্পর্কের বিষয়টিও তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা পায়। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্ণাশ্রম-পীড়িত সমাজের ব্রাহ্মণ বর্ণজাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বারাণসী নগরীর বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা শ্রুতিজাত অভিজ্ঞতা থাকা অসম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্ম্মকেতু-নিদয়ার তীর্থযাত্রার মধ্যে সমালোচকেরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত কবির স্বশ্রেণীর মূল্যবোধ ও জীবনাচারের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন।

গুজরাট-নগরীর সমাজবিন্যাস

যে-কোন সমাজের পরিচয় চিহ্নিত হয় তার অন্তর্কাঠামো তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—ভূমির বণ্টন-বৈশিষ্ট্য, উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদকের সম্পর্কের ওপর।

আর সমাজের এই অন্তর্কাঠামো অর্থাৎ সমাজ-সংগঠনের মৌল ভিত্তিই নির্ধারণ করে দেয় সে-সমাজের উপরিকাঠামো। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌন্দর্যানুভূতি, জীবনযাপন প্রণালী, নগরায়ণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, লোকাচার-লোকবিশ্বাস একটি সমাজের উপকারিকাঠামোর পরিচয়-জ্ঞাপক। আর এই উপরিকাঠামো ঐ-সমাজের অন্তর্কাঠামোরই অনিবার্য অভিব্যক্তি। ফলতঃ সামন্তসমাজের অন্তর্কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য তার উপরিকাঠামোয় অমোঘভাবে হয় প্রকাশিত। মধ্যযুগের বাংলাদেশের সামন্ত সমাজ অন্তর্গত মানুষের জীবনাচারে ও তাদের রচিত সাহিত্যে তাই সামন্ত-সমাজ-সংগঠনের আন্তরবৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়েছে।

দৈবধনে ধনী হয়ে দ্রুততার সঙ্গে কালকেতু তার নগর প্রতিষ্ঠা করলেও নবনির্মিত এই নগরের মানুষের শ্রেণীবিন্যাস, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী, এবং নগরায়ণ বৈশিষ্ট্যে অমোঘরূপে সামন্ত-সমাজের উপরি-কাঠামো বা সুপার-স্ট্রাক্চার-ই লাভ করেছে অভিব্যক্তি। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর ধর্মীয় অনুশাসন ও সংস্কার, ভূমি ও ভূমির বণ্টন-ব্যবস্থার অচলায়তন, জন্মসূত্র-নির্ধারিত বর্ণাশ্রম এবং সম্প্রদায়গত ও পেশাগত ভিন্নতা সামন্তসমাজ অন্তর্গত মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের মৌলসূত্র। এই শ্রেণীবিন্যাস তথা শ্রেণী-বৈষম্যের প্রকৃতি যে সামন্তশাসক ও সামন্ত ভূম্যধিকারীর স্বার্থানুকূলে সংগঠিত এবং সর্বাংশে সামন্ত-নিয়ন্ত্রিত তা বলাই বাহুল্য। গুজরাট নগরীতে আগত জনগণের স্তরবহুল শ্রেণীবিন্যাস তারই সাক্ষ্যবহ। কালকেতুর নগরান্তর্গত মানুষের শ্রেণী-পরিচয় প্রধানত আর্থনীতিক ; একদিকে সামন্ত ভূম্যধিকারী রাজা কালকেতু অন্যদিকে নগরান্তর্গত সাধারণ মানুষ। এতদ্ব্যতীত সামন্তসমাজ-সংগঠনের চারিত্রগত কারণে সাধারণ মানুষের স্তরবহুল শ্রেণী-পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে ধর্মবিশ্বাসে, বর্ণ-বৈশিষ্ট্যে, গোত্র ও সম্প্রদায়গত অবস্থানে এবং পেশা-নির্বাচনে। পেশা-ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস সামন্ত-সমাজ অন্তর্গত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রাগ্রসর চিন্তাধারার দ্যোতক।

সামন্তসমাজ-কাঠামোর স্বরূপসত্য কালকেতুর গুজরাট-নগরে অবিকৃত রূপেই বিদ্যমান—পূর্বেই একথা উল্লেখিত হয়েছে। এ-কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, সামন্তশাসকের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করেই গুজরাট নগরীর ভূম্যধিকারী-রূপে কালকেতুর অবস্থান। তবে কবির প্রত্যাশা-অনুসারেই

সমকালীন অত্যাচারী সামন্তশাসকদের বিপরীতে গুজরাট-অধিপতি কালকেতু অপেক্ষাকৃত উদার এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরূপে চিত্রিত। অন্যপক্ষে কলিঙ্গ ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত নগর-অধিবাসীবৃন্দ সামন্তসমাজের সামন্তশ্রেণী-বহির্ভূত কৃষি ও পেশাজীবী সাধারণ জনগণের পর্যায়ভুক্ত। এই হিসেবে গুজরাট নগরীর সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে সামন্তশাসন-প্রক্রিয়ার প্রচলিত কৌশলের কারণেই সমাজ-অন্তর্গত সাধারণ-মানুষ আরোপিত বিবিধ মানদণ্ডের সূত্রে বহুধা-বিভক্ত। ধর্ম-নির্ভর জীবন এবং দেব-দৈবে আস্থাশীল ভাগ্যবাদী জীবনার্থ সামন্ত-সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মভিত্তিক শ্রেণী-বিভাজন সামন্তশাসন-কৌশলেরই একটি বিশিষ্ট নীতি। কালকেতুর গুজরাট-নগরীতে ইসলাম ও সনাতন তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের আবাস। তবে এই দুই ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আদর্শ নগরীর বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতি ও সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। গুজরাট নগরীতে বসবাসকারী মুসলমানগণের মধ্যেও বংশগত ও পেশাগত বিভাগ পরিলক্ষিত। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

১. কলিঙ্গনগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর-বাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে
বীরের পাইয়া পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে।
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী
খইরত দেয় বীর বাড়ী
পুবের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী
এক-মুদনিয়া ঘর-বাড়ি।
ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ
সোলেমানী মালাধরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
... ...
বড়ই দানীষবন্দ কারেহ না করে মন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি
ধরয়ে কম্বুজ-বেশ শিরে নাহী রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী।

২. বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা।
কেহ নিকা কেহো করে বিহা
মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া।

করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি
বকরি জবাই যথা মোললাকে দেই মাথা
দরে পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।
(১৩০ : ৭৭)

৩. রোজা নেমাজ না জানিঞা বোলাইল গোলা।
তাসন করিয়া কেহো নাম ধরে জোলা।
বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুগরি
পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল পিঠাহারি।
মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
... ...
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর
জীবন উপায় তার পায়্যা তাঁতিঘর।
পট লৈয়া ফিরে কেহো নগরে নগরে
তিরকর হইয়া কেহো নিরমায় শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম বলায় কাগতি
কলন্তর হইয়া কেহো ফিরে দিবারাতি।
(১৩১ : ৭৭)

সেন যুগে সূচিত হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ-প্রথা মধ্যযুগের বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজে শ্রেণী-পার্থক্যকে প্রকটিত করেছে। আধুনিক যুগেও এই বর্ণ-বৈষম্য অবলুপ্ত হয়নি, তবে সমাজের কাঠামোগত তথা গুণগত পরিবর্তনের কারণে এই বর্ণ-ভেদ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও বৈবাহিক-সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সমাজ সর্বাংশে অর্থ বা বিত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মধ্যযুগের সমাজের কাঠামোগত বাস্তবতাই এই বর্ণ-বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সামন্ত-শক্তি তার স্বার্থানুকূল্যে এই মানবতাবিরোধী প্রথাকে সংরক্ষণ করেছে।

কালকেতুর গুজরাট নগরীতে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদ প্রথা ক্রিয়াশীল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে নগরে আগত মানুষের যে বিবরণ উপস্থাপন করেছেন তা বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—চারবর্ণে বিভক্ত মানুষের পরিচয় কালকেতু-উপাখ্যানের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত। কবির প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ অনুধাবনীয় :

১. [ব্রাহ্মণ] পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিয়া বীরে
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন।
(১৩২ : ৭৭)

২. [ক্ষত্রিয়] ক্ষেত্রি বৈসে ভানুবংশ সর্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশ বৈসে মহাজন
পুরান শ্রবণ আগে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেই দান।
(১৩৩ : ৭৯)

[কায়স্থ] ভেট লইয়া দধি মাছ ঘৃত কুম্ভে বান্ধি গাছ
কায়েস্থ আইলা মহাজন
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন।
(১৩৪ : ৭৯)

৩. [বৈশ্য] বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
পালয়ানী বেচে কোন জন।
কেহ দর করি তোলা ছিরা নিলা মুতি পলা
অষেশ সফরে ভ্রমি আনে
সাজন করিয়া নায় নানা সফর যায়
শঙ্খ চন্দন ভরি আনে।
(১৩৩ : ৭৯)

৪. [শূদ্র] মৎস্য বেচে চষে চাষ কৈবর্ত ধীবর দাস
কলু নগরে পিড়ে ঘানী
বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধ বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মজুরি বিকনি।

... ...

চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি
মাল বৈসে পুরের বাহিরে
চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানিফল কেশুর পসারে।

... ...

দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জাতিজীবী বসিল কেয়ালা
কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি
সুড়ির ঘরেতে জার মেলা।

মোজা পানঞি জিন নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে
বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা
কিত্তি করে হরষিত চিতে।
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান

নাটুয়া কলন্ত সঙ্গে বসিল পরমরঙ্গে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥
(১৩৬ : ৮১)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পুনর্বিভাজনও কালকেতুর গুজরাট-নগরীর বসবাসকারী মানুষকে ভিন্ন-ভিন্ন পরিচয়ে চিহ্নিত করেছে। ধর্মের মৌল ভিত্তির প্রতি অনুগত থেকে ধর্মসাধন-পদ্ধতির ও দেবকল্পনার পার্থক্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুর সাম্প্রদায়িক শ্রেণী-পরিচয়। এই সাম্প্রদায়িক শ্রেণী-বিভাজন সূত্রেই গুজরাট নগরীর সমাজবিন্যাসে নাগরিকত্ব লাভ করেছে শক্তিসেবক

শাক্ত সম্প্রদায়, শিবভক্ত শৈব ও কৃষ্ণসেবক বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এতদ্ব্যতীত গুজরাটের বাসিন্দাদের তালিকায় শক্তি-সাধক কাপালিক এবং সহজিয়া সন্ন্যাসীর নামও উল্লেখিত হয়েছে।

পূর্বে লিখিত হয়েছে যে গুজরাট নগরীর সমাজবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রাগ্রসর চিন্তা-শক্তির পরিচায়ক। বলা আবশ্যক, মানুষের পেশাগত স্বাতন্ত্র্য সর্বকালেই ছিল বিদ্যমান, কিন্তু সমাজ-বৈশিষ্ট্যের কারণে ধর্মীয় শ্রেণীকরণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মানুষের পেশা-পরিচয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু-উপাখ্যানের নবপ্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীর মানুষের শ্রেণী-পরিচয়ে শ্রেণীবিভাজনের অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি মানুষের পেশাভিত্তিক শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে গুজরাট নগরীতে যে-সব পেশাজীবীর[২৩] আগমন ঘটেছে তারা হল : যাজক, জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক, বৈশ্য-মহাজন, বৈদ্য, গোপ, 'তেলি', চাষী, কামার, তাম্বুলি, কুম্ভকার, 'তন্ত্রবায়' (তন্তুবায়), মালী, বারুই, নাপিত, মোদক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক, কাঁসারি, সুবর্ণবণিক, কলু, মাটিয়া (জাল প্রস্তুতকারী), ধোপা, দরজি, শিউলি ; ছুতার, পাটনি, জগাভাট, পসারী, 'জাতিজীবী' (জায়াজীবী), চামার, বারবণিতা, কুমার, চালুয়াতি, ময়রা ইত্যাদি।

সামন্ত-সমাজের সমৃদ্ধির যুগে শাসকশ্রেণীর শাসনকৌশলের ছত্রছায়ায় এই বিচিত্রমাত্রিক শ্রেণীবৈষম্য অচলায়তন সমাজে আরোপিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই স্তরবহুল শ্রেণীবিন্যাস সর্বাংশে সামন্ত স্বার্থকেই সংরক্ষণ করেছে—আর দেব-দৈবে আস্থাশীল বিজ্ঞানবুদ্ধিরহিত মানুষ শ্রেণীগত অন্তর্বিভেদ-সূত্রে নিজেদের পরস্পর-বিচ্ছিন্নতাকে দৈব-ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছে নির্বিবাদে। সামন্ত-স্বার্থের সংরক্ষক এই শ্রেণীবৈষম্য-প্রথা মুঘল যুগের বাংলাদেশে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু-নির্মিত গুজরাট-নগরীর সমাজবিন্যাসে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজ-সত্যকেই অবিকৃতরূপে উপস্থাপন করেছেন।

নির্মিত নগর : অর্থনৈতিক অবস্থা ও কবির প্রত্যাশার বাস্তবায়ন

উল্লিখিত হয়েছে যে, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সামন্ত-ডিহিদার কর্তৃক অত্যাচারিত হ'য়ে স্বদেশ বিতাড়িত হয়েছিলেন বলেই একটি স্বতন্ত্র, কল্যাণময়,

আদর্শ আবাস-ভূমির কল্পনা ছিল তাঁর হৃদয়-অন্তর্গত। এই জন্যেই তাঁর আদর্শবাহী চরিত্র কালকেতুর নির্মিত নগরে বাস্তবায়িত হয়েছে কবির অভীষ্ট। ফলতঃ এই নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কল্যাণধর্ম, হ্রাস পেয়েছে অর্থ-নৈতিক ভেদবুদ্ধি। স্বসমাজের জন্য বাস্তবানুগ না-হলেও কবির তিক্ত-স্মৃতি-অভিজ্ঞতার কারণেই সমকালীন সামন্তরাষ্ট্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিক-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবনির্মিত গুজরাটে। কলিঙ্গ দেশাগত 'বুলন মণ্ডলের' উদ্দেশে উচ্চারিত আহ্বান-বাক্যে কালকেতু তাঁর রাজ্য-নীতির সারাৎসার ব্যক্ত করে বলেছে :

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ কয়িব (Sic) দূর
কানে দিন হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর
হাল পীছে একতঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর।
নাঞি দিহ বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে
সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট দেশে।

পার্বনি পঞ্চক-জাত ওড়া-লোন সানা-ভাত
ধানকাটী কলম-কসুরে
জত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।

জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর
চাষ ভূমি বাড়ি দিব দান
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পূরিব সভার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান।
(১২৭ : ৭৫)

ডিহিদারের অত্যাচারের স্মৃতিবেদনাই যে এই সদর্থক রাষ্ট্রচিন্তায় স্থিত হতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা সহজেই অনুমানসাধ্য।

এ-কারণেই কালকেতু তার নগরে রাজ্য শাসনের এক উদারনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি গ্রহণ করেছে ; সাত বছরের জন্য মওকুফ করেছে আবাদযোগ্য জমির জন্য দেয় কর, অবসান ঘটিয়েছে ডিহিদার নিয়োগের প্রথা, বিলোপ করেছে উৎসব-কর ('পার্বনি'), লবণ-কর ('ওড়া-লোন'), পাইকের ব্যয়-নির্বাহ বাবদ প্রজার দেয় কর ('সানা —ভাত'), ধানকাটার জন্য নির্ধারিত কর ('ধান কাটী'), হিসেবে ভুল হতে পারে আশঙ্কায় অগ্রিম আদায়যোগ্য কর ('কলম কস্মুরে'), এবং "পাঁচ শতাংশ ইত্যাদি কর সমূহ"[২৪] ('পঞ্চক-জাত')। এবং কালকেতু একইসঙ্গে প্রজাদের নিশ্চয়তা দিয়েছে অবাধ-বাণিজ্যের, অতিরিক্ত করারোপ না-করার দিয়েছে প্রতিশ্রুতি। আর এভাবেই কালকেতুর নগরী অর্থনৈতিক নিপীড়ন-মুক্ত হয়ে অর্জন করেছে কল্যাণ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ধনী-দরিদ্র, শঠ-প্রবঞ্চক, লম্পট-বারবণিতা, বিদ্বান-মূর্খ সবাই নাগরিকত্ব লাভ করেছে এই রাষ্ট্রে— বস্তুনিষ্ঠ-কবি এই নগর-নির্মাণ সূত্রে নিজের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন করলেও এর নাগরিক-বিন্যাসের মাধ্যমে নিজের সমগ্রতাবোধের পরিচয় দিয়ে নিজের প্রখর পরিমিতিবোধকেই করেছেন চিহ্নিত। অরবিন্দ পোদ্দার 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কলিঙ্গদেশের চণ্ডীর আশীর্বাদ না-পাওয়া জীবনের দেবতা শিব যেহেতু কর্মবিমুখ উদাসীন[২৫] সেহেতু "চণ্ডীর আশীর্বাদ-পাওয়া নবজীবনে"র[২৬] সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে যে গুজরাট-নগরে, সে-নগরে নবজীবন-প্রত্যাশী মানুষের আগমন স্বাভাবিক। তিনি লিখেছেন :

> কালকেতু চণ্ডীর আশীর্বাদে নতুনরাজ্য স্থাপন করল ; সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই কোন অমর্যাদা হবে-না ; কোন অকল্যাণবুদ্ধিই সেখানে জয়যুক্ত হবে না ; সেখানে চাওয়া বৃথা আশায় কেঁদে কুটে মরবে না, সার্থক পাওয়ায় পরিণত হবে।...সুতরাং কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই এই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে।[২৭]

উল্লেখ্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কল্যাণকামী আদর্শের বাহক কালকেতুর নির্মিত এই নগরে শান্তি বিঘ্নিত করেছে ভাঁড়ু দত্ত। নগর নির্মাণের উদ্যোগ-পর্বে মুরারি শীলের ভূমিকাও ছিল প্রায় অনুরূপ। ভাঁড়ু দত্ত যেন ডিহিদার মামুদ সরীপের প্রতিভূ-রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে এই কাব্যে। স্মরণীয়, যে কল্যাণবোধে প্রাণিত হয়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এই নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে

চেয়েছেন তাঁর সেই কল্যাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতু যেমন মুকুন্দরামের কল্যাণকামী আদর্শের বাহক, ভাঁড়ু দত্ত তেমনি কল্যাণবিরোধী অপশক্তির প্রতীক।[২৮] তবে নবপ্রতিষ্ঠিত এই নগরীতে অপশক্তির প্রতীক এই প্রতিবন্ধক-শক্তি শক্তিশূন্য হয়েছে, এবং পরিশেষে জাত্যভিমানী ও অত্যাচারী ভাঁড়ু দত্ত দণ্ডভোগ শেষে সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ হয়ে গুজরাটের নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছে। এবং এভাবেই গুজরাট নগর-রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বদেশ-উন্মূলিত কবির অন্তর্গত প্রত্যাশা পেয়েছে বাস্তব-রূপ।

উৎস-নির্দেশ

১ দীনেশচন্দ্র সেন : "১৫৭৭ খৃ. অব্দে কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৩৭ খৃ. অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড); সম্পাদক, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র. প্র. ১৮৯৬, নবম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৪৩৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য : "...অতএব ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে এই কাব্য-রচনা সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হয়।" 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,' প্র. প্র. আশ্বিন ১৩৪৬ ; পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৫, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫০৩

সুকুমার সেন : "অতএব দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মানিতে হইবে যে মুকুন্দের আড়রা গমনের (দেশত্যাগ বলিব না) কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।" কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল', সম্পাদক শ্রীসুকুমার সেন, প্র. প্র. বৈশাখ ১৩৮২, সাহিত্য অকাদেমী, নয়া দিল্লী, দ্র. ভূমিকা-পৃ. ২৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে যে একখানি কাব্য সংকীর্ণ ধর্মমত প্রয়োজন ছাড়াইয়া সার্বভৌম রসস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৫৭৯ খৃ. অ. বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।" 'কবি-কঙ্কণ-চণ্ডী', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, নূতন সংস্করণ (পুনর্মুদ্রিত), ডিসেম্বর ১৯৭৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্র. ভূমিকা : পৃ. ।৶

ক্ষুদিরাম দাস : "...এইভাবে বলা যায় কবির জন্ম ১৫৬০ খ্রী. এর বেশী আগে-পরে হতে পারে না।" 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', নূতন প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭, বি. চাঁদ এ্যান্ড্ সন্স্, কলকাতা, দ্র. ভূমিকা : পৃ. xxviii

২ 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র বিভিন্ন সংস্করণে মানসিংহের নামযুক্ত চরণের পাঠভেদ পরিলক্ষিত। এই পাঠভেদ অর্থ পরিবর্তনের দ্যোতক। কবির কালনির্ণয়ে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র সম্পাদকবৃন্দ স্ব-স্ব পাঠ-কে উপলক্ষ্য করে যুক্তি বিন্যাস করেছেন। যে-সকল পাঠ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি হল : 'সে মানসিংহের কালে' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) : 'রাজা মানসিংহ গেলে' (সুকুমার সেন) ; 'রাজা মানসিংহ-কালে' (ক্ষুদিরাম দাস)। 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অধ্যায়ে উপস্থাপিত সমাজ-চিত্রের সঙ্গে মানসিংহ-শাসিত ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের সমাজের সাদৃশ্য হেতু আমরা ক্ষুদিরাম দাস-গৃহীত পাঠকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছি।

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার ; 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) : "মুঘল (মোগল) যুগ", রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৩০

৪ 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' : ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১৪ (উদ্ধৃত)

৫ "অত্যাচারী মাহ্মুদ সরিপ কর্তৃক তিনি নিজের জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন ; অতএব গৃহ হইতে নির্বাসনের যে কি দুঃখ, তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৯

৬ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' : শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২, সাহিত্য অকাদেমী, নয়া দিল্লী। অতঃপর বর্তমান-নিবন্ধে উপস্থাপিত কাব্যাংশের উদ্ধৃতিসমূহ সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর এই সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৭ শ্রীসুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড : পূর্বার্ধ), প্র. প্র. ১৯৪৪, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫৩০

৮ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

৯ ক্ষুদিরাম দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. xxxvii

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. xxxi

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

১২ সুখময় মুখোপাধ্যায় ; "হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব" : 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (দ্বিতীয়খণ্ড) ; রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১৬

১৩ আকরম হোসেন : "বাঙলাদেশ", 'বাঙলাদেশ' : মনসুর মুসা সম্পাদিত, প্র. প্র. ১৯৭৪, বাঙ্‌লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৩

১৪ "বস্তুত মানসিংহকে খুবই তাড়াহুড়ো করে গৌড় সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট নূতন ব্যবস্থায় নামতে হয়েছিল, কাজ আরম্ভ করতে হয়েছিল জরুরী ব্যবস্থার মানদণ্ডে। জরুরী ব্যবস্থার জন্যেই বড় বড় গ্রামে প্রত্যক্ষ ক্ষুদে অফিসার ডিহিদারের সৃষ্টি, প্রজাদের আটকাতে জান্‌দার পুলিশের সৃষ্টি। ...আকবর-নামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে গৌড়ে ঠিক এই সময়কার ঐ সব পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত দেওয়া রয়েছে।" ক্ষুদিরাম দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. xix

"'কবিত্ব লাভের ইতিবৃত্ত' অংশে কবিকঙ্কণ যে রাষ্ট্রিকতার ছবি তুলে ধরেছেন তা উক্ত নববিধানের। ...জমির পুরাতন মাপের জায়গায় স্বল্প-কম দৈর্ঘ্যের নোতুন মাপের প্রবর্তন, উর্বর-অনুর্বর ভেদে জমিজমার বিভাগ ও রাজস্ব নির্ধারণ, অপেক্ষাকৃত স্বল্পমান পুরানো মুদ্রার জন্য দেয় বাট্টা, সর্বভারতীয় নোতুন ওজনের পত্তন—এসব বিষয় দ্রুতগতিতে এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে চালু করার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষকেই বিব্রত হতে হয়েছিল। এটি ১৫৯৫ এর আগেকার ঘটনা হতে পারে না। ইতিহাস বলছে, সুশৃংখল বিধিবদ্ধ ও প্রায় সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবরের নির্দেশ-নামা ১৫৮৬ খ্রী. প্রদত্ত হলেও বাঙ্‌লায় তখনই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।" পূর্বোক্ত, পৃ. xx-xxi

১৫ H. K. Naqvi, *Urbanisation and Urban Centeres under the Great Mughals* (1556-1707), First Published 1972, Indian Institute of Advanced Study, Simla, p. 131

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪

১৭ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' : শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১৮ "বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের সংস্কার লইয়া তিনি কালকেতুর ব্যাধ-জীবনকে রূপায়িত করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহার বাস্তব ধর্ম ক্ষুণ্ন করিয়াছেন, সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তিনি ব্যাধ-জীবনকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি কালকেতুর হিন্দু সমাজোচিত নামকরণ এবং কর্ণবেধ, তাহার বিবাহ প্রথায় উচ্চতর হিন্দু-সমাজের বিবাহ-প্রথা, বার্ধক্যে ধর্মকেতুর বারাণসী বাস, কালকেতু ও ফুল্লরার মুখে রামায়ণ মহাভারতের নীতিকথা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়াছেন।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৮

১৯ Hameeda Khatoon Naqvi, *Urban Centres and Industries in Upper India* (1556–1803), First Published 1968, Asia Publishing House, Bombay, p. 87

২০ *Ibid*, pp. 133-34

২১ *Ibid*, p. 131

২২ *Ibid*, p. 132

২৩ গুজরাট নগরীতে আগত মুসলিম পেশাজীবীর বিবরণ পূর্বে কাব্যাংশের উদ্ধৃতি-সূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে বলে এই তালিকায় সে-সব পেশা-পরিচয় উল্লেখিত হয়নি।

২৪ কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২

২৫ অরবিন্দ পোদ্দার; 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ', প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৫২, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৮১, উচ্চারণ, কলকাতা, পৃ. ৮৭

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

২৮ এ-প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার-এর ভাষ্য :

"...কিন্তু এই সাধারণ সুখসমৃদ্ধি শান্তির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত একমাত্র ভাঁড়ু দত্ত। তাকে চিত্রিত করা হয়েছে সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতীক হিসাবে, মানুষকে নানাভাবে বঞ্চনা ও ছলচাতুরী করে সে বেঁচে থাকে। ...সমস্ত নাগরিকের নিকট ভাঁড়ু দত্তের লাঞ্ছনা অপমান সম্ভবত সমাজদ্রোহী ব্যক্তি ও শক্তির উদ্দেশে এক নিশ্চিত সাবধানবাণী।" পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১